আর - এক অনন্যতার সন্ধানে

দীপেন্দু চক্রবর্তী

মহাশ্বেতা দেবী আর - এক অনন্যতার সন্ধানে

মহাশ্বেতা দেবীর অনন্যতা যেমন স্বীকৃত তেমনি পুরস্কৃত, আবার কিছুটা বিতর্কিতও। বাংলা সাহিত্যে আর কোনো নারী এমন সাড়া - জাগানো রূপান্তরের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। শু করেছিলেন তিনি সাহিত্যের অভ্যস্ত পথে, তাঁরপর বাঁক নিলেন এমনভাবে যেখানে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বামপন্থী সাহিত্যিকেরা, যাঁরা পুষ। এই প্রতিযোগিতাতেও তিনি তথাকথিত কৃষক - মজুরের বহুশ্রুত শ্রেণীসংগ্রামের সীমানা পেরিয়ে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছে গিয়ে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। নারীর বর্তমান সামাজিক অবস্থান ও তার আত্মপরিচয়ের পুনরাবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি নারীব াদীদের মতোই সতর্ক ও সচেতন। কিন্তু তাঁর লেখার জগতে নারী - চেতনার একাধিপত্য নেই; তিনি লিঙ্গভেদের সা ম্প্রতিক আগ্রাসী প্রভাবকে অস্বীকার করে বৃটিশ শাসন থেকে আজকের স্বাধীন ভারত এই ব্যাপক মানচিত্রে ক্ষমতাসীন জনগোষ্ঠীর দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষ কীভাবে যুগ - যুগ ধরে নিপীড়িত হয়ে থাকে এবংপ্রয়োজনে প্রতিরোধ করে তার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে চলেছেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি এখন বাংলা ছাড়িয়ে সর্ব- ভারতীয় স্তরে অভিনন্দিত, আবার গ ায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সৌজন্যে পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিয়াতেও সমাদৃত। গায়ত্রী তাঁর লেখাকে স্থান দিয়েছেন যে- তা লিকায় তা হল Bronte, Mary Shelley, Baudelaire, Kipling, Rhys, Mahasweta, Coetzee (A Critique of Post – Colonial Reason) । এ সৌভাগ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়নি, তারাশঙ্করেরও না, অমিয়ভূষন মজুমদার বা সমরেশ বসুরও না।

মহাশ্বেতাকে নিয়ে যে - হৈচৈ তা শুধুই তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য নয়, তিনি যে সাহিত্য রচনার বাইরেও তাঁর উপজীব্য বিষয় অর্থাৎ প্রান্তিক নিম্নবর্গ মানুষদের সঙ্গে একান্ত হবার চেষ্টা করে চলেছেন নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে (যা বিপ্লবী পুষলেখকেরাও পারেনি) এই ব্যতিক্রমী ঘটনাটাও তার একটি কারণ। বস্তুত মহাশ্বেতা নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর দায়বদ্ধতা প্রধানত নিপীড়িত কোণঠাসা দলিতদের প্রতি, এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম তারই একটি মাধ্যমমাত্র। সেই - কারণেই তিনি 'বর্তিকা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন, যার লক্ষ্য এইসব জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা। একই উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্য পত্রিকাতেও রিপোর্টাজ লিখছেন। অথচ তিনি কোনো বামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নন। একসময় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বহুকাল নিজস্ব প্রগতিশীলতার অবস্থান স্থির করে নিয়েছেন।

মহাশ্বেতাকে ঘিরে যতটুকু বিতর্ক তার অল্পই লিখিত আকারে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। অধিকাংশই শোনা যায় মৌখিক মতামত বিনিময়ে। এই বিতর্কের প্রধান বিষয় তাঁর প্রগতিশীল রাজনীতির একক অবস্থান। নকশালপন্থী সশস্ত্র সংগ্র ামের প্রতি তাঁর সমর্থন থাকলেও তিনি তাঁর প্রবক্তা হয়ে উঠতে চাননি। অন্যদিকে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির বিচ্যুতি ও বিকৃতি সম্বন্ধে তিনি নির্দয় সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর মতে, সৎ মানুষ সব দলেই আছে, এবং এই সৎ ম ানুষদের স্বীকৃতি দিতে তিনি দল বিচার করেন না। যাঁরা দলীয় রাজনীতিকে প্রগতির মাপকাঠি হিসেবে দেখে থাকেন তাঁরা অবশ্যই এমন উদারতাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন, কিন্তু মহাশ্বেতা তাতে বিন্দুমাত্র নিৎসাহিত হন না।

'আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়। 'জল' গল্পের মাস্টার সৎ ও বিবেকী কংগ্রেসী। 'এম, ডবলু, বনাম লখিন্দর' গল্পের খেতমজুর আন্দোলন সি.পি.আই. এর খেতমজুর আন্দোলন সি.পি.আই. এর খেতমজুর যুনিয়নের নেতৃত্বদত্ত আন্দোলন। 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের কালী সাঁতরা সি পি এম দলভুক্ত এবং বসাই টুডু স্বয়ং নকশাল আন্দোলনকে ছাড়িয়ে যায়। আবার 'দ্রৌপদী' গল্পের নায়িকা আদিবাসী নকশালধর্মী। মানসিকতায় এরা কোথাও এক, এবং সেই একীভবন আমার কাছে স্ব বিরোধী নয়। জীবন অঙ্ক নয়, এবং রাজনীতির জন্য মানুষ নয়, মানুষের স্বাধিকারে বাঁচার দাবিকে সার্থক করাই সকল রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস।'

'অগ্নিগর্ভ' গ্রন্থের ভূমিকায় মহাশ্বেতার এই ঘোষণার স্পষ্টতা যেমন প্রশংসনীয় তেমনি সকল রাজনীতির লক্ষ্য এক হওয়া উচিত এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে যায় একধরনের ভাববাদ, যা মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আবার আধুনিকমার্কসবাদীরা 'মানুষের জন্য' রাজনীতি ধারণাটিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদের রেশও দেখতে পারেন। 'মানুষ' ধারণাটিও যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দান তা অস্বীকার করে তাকে এক অপরিবর্তনীয় শাশ্বত ধারণা বলে তুলে ধরায় মহাশ্বেতা নিজেই বিতর্কের দ্বার খুলে দেন। যাঁরা তাঁকে 'হাজার চুরাশির মা'র রচয়িতা হিসেবে নকশাল আন্দোলনের একজন সমর্থক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরাও পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছে, কেননা তাঁর লেখায় মুক্তির পথটি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়নি। মহাশ্বেতা নিজেই তার উত্তরে বলেছেন, 'যাঁরা বলছেন যে আমি শোষণ - বঞ্চনা দেখাচ্ছি, এ থেকে উত্তরণের কথা বলছি না, -- তাঁদের বলব যে যদি আমার লেখা তাঁদের বোঝাতেপারে যে অবস্থাটা অসহনীয় এবং এ থেকে মুক্তি দরকার, তাহলেই আমি উদ্দেশ্যলাভে সফল (গ্রাম বাংলা, ভূমিকা)।'

উত্তরণের দাবিটা বহুদিনের। সোভিয়েত রাশিয়ায় সোশালিস্ট রিয়্যালিজমের প্রতিষ্ঠা থেকেই এদেশের মার্কসবাদীরা কাহিনীরশেষে উত্তরণের অবশ্যম্ভাবিতা ধরে নিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে যেমন তেমনি সত্তরের দশকেও এই উত্তরনের যান্ত্রিকতা আমাদের বামপন্থী সাহিত্য ও নাটকের বিপুল সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে রেখেছিল। মহাশ্বেতার সাহসিকতা এইখানে যে তিনি সমাজ - বাস্তবতারফর্মুলা অগ্রাহ্য করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বোধির ওপর নির্ভর করতে পেরেছেন। সাহিত্যিক যে বিপ্লবী নেতার মতো পথ দেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, করলে যে তিনিই নেতা হয়ে যেতেন, গোর্কিই হয়ে যেতেন লেনিন, লু সুন হয়ে যেতেন মাও - জে - দং, এই ভ্রান্তি বোধহয় এখনও অনেক বাঙালি মার্কসবাদী সমালোচকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আছে। তাই তাঁরা বামপন্থী লেখকের কাছে আশা করেন নির্ভুল রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও নির্দেশ। মহাশ্বেতার সাফল্য রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়, তিনি সাহিত্যিক, এবং সাহিত্যিক হিসেবেই তিনি রাজনীতিকে উপস্থিত করেছেন, যে - রাজনীতি তত্ত্বকথায় আটকে না থেকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। তাঁর রাজনৈতিক মতামতে আবেগের ছাপ বেশ স্পষ্ট, যেমন তিনি বলেন, 'যাদের জীবনে আগুন জ্বলছে, তাদের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা যে তারাকখনো ভুল করবে না। তারা তো কোনোদিন ভুল করেনি তেভাগা বা নকশালবাড়ি বা তেলেঙ্গানায় (গ্রাম বাংলা, ভূমিকা)' শোষিত মানুষ ভুল করে না এমন ধারণা পোষণ করার জন্য যে - আবেগ দরকার তা মহাশ্বেতার আছে। তা খণ্ডন করাও কঠিন নয়। কিন্তু এই আবেগ থেকেই মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে, এবং হয়। মহাশ্বেতার অনেক রচনাই সার্থক হতে পেরেছে এইরকম আবেগপূর্ণ সমাজচেতনা থেকে।

তাঁকে নিয়ে যে-বিতর্ক তার জন্য বোধহয় তিনি নিজেই দায়ী, যেহেতু তিনি সাহিত্যসেবার বাইরে পা দিয়ে সমাজসেবায় নেমেছেন। একদিকে এই সমাজসেবা সম্বন্ধেই বিপ্লবীদের সন্দেহ বহুকালের, অন্যদিকে এই সমাজসেবাই তাঁর সম্বন্ধে অনেকের আশা চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। অন্য বামপন্থী লেখকদের এই সমস্যা নেই, কেননা তাঁরা শুধু সাহিত্যেই তাঁদের দায়িত্ব নিঃশেষিত করেন। তিনি যেএকজন খাঁটি প্রগতিবাদীর ভাবমূর্তি গড়তে পেরেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল অনুষ্টুপের (শারদীয় ১৪০৬) পাতায় অশোক মিত্রের লেখায় (রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে)। কেন মহাশ্বেতা দেবী জয়া বচচনের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 'হাজার চৌরাশিকি মা' হিন্দি ছবির অনুষ্ঠানে, কেন ব্রতীর মা সুজাতার ভূমিকায় নামানো হল এমন একজন অভিনেত্রীকে যাঁর পরিবার ব্রতীর মতো নকশাল তণদের খতম করার জন্য সদাতৎপর দিল্লির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ ছিল, এবং মহাশ্বেতা তাতে আপত্তি করেননি? অতীব বিদগ্ধ পোড় - খাওয়া রাজনীতিবিদ অশোক মিত্রের এই শিশুসুলভ সরলতা কোনো ব্যতিক্রম নয়, কেননা আমাদের বামপন্থীদের একটি অংশ এখনও শুচিতা রক্ষার

ব্যগ্রতায় অভিনেতার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তার ভূমিকার (role) পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেন। নকশাল তণদের যেন শুধু দিল্লির নির্দেশেই খতম করা হয়, এ বঙ্গের বামপন্থী সরকার নকশালবাড়ি নামক অঞ্চলটিতে যেন শ্বেত কপোত ওড়ানোর জন্য পুলিশ পাঠিয়েছিল। অশোক মিত্রের হাহাকার শুনে মনে হতে পারে, মহাশ্বেতা তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের বিশুদ্ধতা হা রিয়েছেন এই একটি ঘটনায়, অশোক মিত্র তাঁর সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনে যা হারাননি। মহাশ্বেতা যে - রাজনৈতিক বিশ্বাসে চা লিত হয়েছেন তাতে দক্ষিণপন্থী ও ক্ষমতালোভী বাবু বামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্যটা কখনোই বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। সে দিক থেকে তাঁর জয়া বচ্চনের সঙ্গ ত্যাগ করার যেমন কারণ নেই তেমনি দলিতদের হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং -এ আর্জি পেশ না করাও কোনো যুক্তি নেই। তিনি বিপ্লব করছেন না, শুধু সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানুষদের কাছে গিয়ে সঠিকভাবে চেনার চেষ্টা করেছেন, এবং যাঁরা তাদের চেনেন না, বা ভুলভাবে চেনেন তাঁদের চেনাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রয়োজনে এইসব মানুষদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে তিনি মদত দিতে প্রস্তুত, তা বিদ্রোহ হতে পারে, হতে পারে একটি কূপখননের মতো অতি তুচ্ছ এক সংগ্রাম।

'আমি তো চেষ্টা করছি যা দেখছি বা জানছি তা যথাযথ লিখতে।' এই অঙ্গীকারেই তো একজন লেখকের সততা প্রমাণিত হতে পারে। মহাশ্বেতা গোবিন্দ নিহালনির ছবি 'হাজার চৌরাশিকি মা'র স্পিটে যে - সংযোজন করেছেন তাতে সুজাতা, ব্রতীর মা, এখন একজন মানবাধিকার কর্মী। ইরাবান বসুরায় তাতে আপত্তি তুলেছেন (অনুষ্টুপ, প্রাক - সারদীয় ১৪০৫) ---'অত্যাচার - নিপীড়নের শিকার যারা তাদের সাহায্য করাই তাঁর কাজ, কোনো রাজনীতি জানার দরকার নেই তাঁর।' বোঝাই যাচ্ছে ইরাবান উপন্যাসে সুজাতা যেরকম আকস্মিকভাবে মারা যায় তাতেই বেশি আশ্বস্ত ছিলেন। সুজাতা বেঁচে থ াকলে কী করতে পারতেন? গোর্কির 'মা' হয়ে উঠতেন? পঁচিশ বছর পরে নকশালপন্থী তণরা কী করছেন এখন? মহাশ্বেতা দেবী নিজেই তো আর - একটা 'হাজার চুরাশির মা' লিখতে পারেননি। তাঁর নিজের কাজও তো মানবাধিকার রক্ষা। তিনি যা দেখেছেন এবং দেখছেন তা-ই লিখছেন। বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি দরদ এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ এক ব্যাপার নয়। ব্রতীর মা সুজাতা কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করেননি তাঁর ছেলের রাজনীতিটা কেমন। ব্রতীও কি চেয়েছিল বোঝ াতে? তাঁর কাছে জন্মদিনে মায়ের হাতের পায়েস খাওয়াটা যত বড় ছিল, তত বড় হয়ে ওঠেনি মার রাজনৈতিক চোখ ফুটিয়ে তোলা। ব্রতী পাভেল হতে পারেনি, সুজাতাও পেলাগিয়া নিলোভনা হতে পারেন না। তাছাড়া, পঁচিশ বছর অ াগেকার সেই প্রাণ দেওয়া - নেওয়ার সংগ্রাম তো এখন নিরাপদ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের লাভজনক পণ্য। নিজেদের দিকে তাকালেই তো এই পরিবর্তনটা মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না।

না, মহাশ্বেতার ভাবালুতা যেমন আছে তেমনি বাস্তবকে বাস্তব বলে মানার সাহসও আছে। তাই তিনি গোবিন্দ নিহালনির সঙ্গেসহযোগিতা করতে পিছপা হন না, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সহায়তায় পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক জগতে প্রবেশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি, সাহিত্য অ্যাকাডেমি - জ্ঞানপীঠ পুরস্কার যেমন সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন, ম্যাগসাইসাই পুরস্কার নিতেও দ্বিধা করেননি। যাঁরাএইসব পুরস্কার গ্রহণে মহাশ্বেতার প্রগতিশীলতা বিপন্ন বলে মনে করেছেন তাঁদের উদ্দেশে মহ াশ্বেতার উত্তর অকাট্য বলেই মনে হয়---'পুরস্কার বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ কন। সিনেমা - থিয়েটার, বিশেষ সিনেমা ক্ষেত্রে পরিচালকরা অসংখ্য সরকারী পুরস্কার ও সম্মান পান। আপনি তাঁদের সততায় প্রশ্ন তোলেন না। সিনেমার বেলা ব ামপন্থী পরিচালককে আত্মবিক্রয় বা আপসের কথা বলবেন না এবং সাহিত্যের বেলা বলবেন, এতদ্বারা প্রমাণ হয় আপনি দুই রকম বিচারবোধে চালিত হচ্ছেন (গ্রাম বাংলা, ভূমিকা)।'

বস্তুত আমাদের না মেনে উপায় নেই যে মহাশ্বেতা মিডিয়া হাইপ, পুরস্কার, বিপ্লব ও বিচ্ছিন্ন সমাজসেবার মতো দুই ভিন্ন জগতে বিচরণ ইত্যাদি সত্ত্বেও আর - পাঁচজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি সাহস রাখেন, এবং নিজস্ব প্রগতিশীল কর্মসূচী রূপায়ণে পরিশ্রম করেন আন্তরিকভাবে। আমাদের বারবারই মনে হয় একজন বাঙালি জাঁ পল সার্ত্র পেলে ভালো হত, অন্তত সত্তর দশকে তাই চেয়েছিলাম, যিনি নোবেল পুরস্কারও প্রয়োজনে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এবং এ কথাও বলবেন যে সাহিত্যের চেয়ে এখন অনেক বেশি প্রযোজন দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা। মহাশ্বেতার কাছ থেকে যা পাওয়া গেছে তাতেআমাদের প্রত্যাশাটা আরো বেড়ে যাওয়ায় যত বিপত্তি ঘটেছে। তিনি যখন 'ভট্টাচার্য' ছিলেন, তখন যে - রকম গল্প - উপন্যাস লিখেছিলেন (এতটুকু আশা, তিমির লগন, মধুরে মধুর, প্রেমতারা) তাতে তো এমন প্রত্যাশার কারণ ছিল না। তিনি যখন 'দেবী' হলেন এবং 'হাজার চুরাশির মা' লিখলেন তখন

এমন একটা পাল্তর ঘটেগেল যার তুলনা চলে একমাত্র উৎপল দত্তের ইংরেজি থিয়েটার থেকে বাংলা প্রতিবাদী থিয়েটারে উত্তরণের সঙ্গে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উৎপল দত্তওএরকম প্রত্যাশা জাগিয়ে পরে বিপ্লবীদের হতাশা করেছিলেন। তবে মহাশ্বেত ার ক্ষেত্রে আপসের বহরটা কম হওয়ায় বোধহয় তিনি এখনও উৎপলের মতো বিতর্কিত হয়ে ওঠেননি। কিন্তু তেমন ব্য াপক না হলেও বিতর্ক মহাশ্বেতার পিছু ছাড়বে বলে মনে হয় না।

তিনি বলেছেন, 'যাঁরা বলেন, সাহিত্যের বিচারে আমার লেখা ব্যর্থ হচ্ছে, 'অপারেশন? ---বসাই টুডু' বা 'স্তনদায়িনী'র শৈলী - ভাষা - আঙ্গিক নির্মাণে আমি ব্যর্থ হচ্ছি, তাঁদের বলব, যে সাহিত্যের নির্মিতিগত উৎকর্ষে এ লেখক আগ্রহ পায় না আর। যাঁরা সক্ষমতাঁরা কন। এ সঙ্গে এ কথাও সবিনয়ে জানাই, যে যেহেতু সারা বছর অন্যরকম কাজকর্মে কাটে, সেহেতু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য গোছের আলোচনায় কোন উৎসাহ পাই না। এগুলোকে আমার ব্যর্থতা বলেই মেনে নিন (গ্রাম বাংলা, ভূমিকা)।'

এরকম বিবৃতিতে মনে হতেই পারে মহাশ্বেতার কাছে এখন সাহিত্য বৃহত্তর সামাজিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গমাত্র, তা'সাহিত্য' হল কিনা এ বিচারে তিনি আগ্রহী নন। এমন নয় যে তিনি 'সাহিত্য' নামক ধারণাটিই ত্যাগ করেছেন, করলে এ ব্যাপারে তাঁর 'ব্যর্থতার'র কোনো স্বীকারোক্তির প্রয়োজন হত না। আসল কথা, মহাশ্বেতা নিজের মতো করে একটি সাহিত্যের ভাষা ও আ ঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন যার সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত নান্দনিকতার ধারণা নাও খাপ খেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মহাশ্বেতার এই ভাষা, আঙ্গিক ও আখ্যান - রীতি। এ ক্ষেত্রেও তিনি কতটা অনন্য তার অনুসন্ধানই এ আলোচনার লক্ষ্য

মহাশ্বেতার বৈপ্লবিক রূপান্তরের আগে তাঁর ভাষা ও আখ্যান - রীতি তেমন নতুনত্বের দাবি না করলেও অন্যান্য মহিল ালেখকদের চেয়ে তা ছিল অনেক বেশি ঋজু ও মজবুত। যদিও তিনি প্রথাগত রোম্যান্টিক ও বাস্তববাদী দু'রকম ঐতিহ্যের মধ্যেই স্বচ্ছন্দে চলাফেরাকরেছেন, কিন্তু বিষয়ই তাঁর ভাষা ও আখ্যান - রীতি নির্বাচন করতে বাধ্য করেছে। 'নটী' উপন্য াস (১৯৫৭) শু হয় এইভাবে --'একশ' কুড়ি বছর আগেকার কথা'। এই অতীতযাত্রা ও অভিজাত সামন্তশ্রেণীর পরিবেশ ধরার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন সেই ভাষা যাতে কোনো ঝুঁকি নেই, যা বহুকাল ধরে ঐতিহাসিক রোম্যান্সে স্বীকৃত--- 'নক্ষত্রখচিত আকাশ, মাঝরাতের উত্তাল বাতাস, অশ্রুত কোন মহান সঙ্গীতে জানালো তাদের শেষ প্রণতি। পরম মমতায় তা গ্রহণ করলো মৃত্তিকা।'

আবার 'প্রেমতারা'য়, যেখানে সার্কাসের মানুষই বিবেচ্য, পাওয়া যাবে যেমন প্রখর বাস্তববাদী আখ্যান, তেমনি নির্ভার ঋজু ভাষা। নৃত্যশিল্পীদের প্রেম ও সংগ্রাম নিয়ে লেখা 'মধুরে মধুর' উপন্যাসের ভাষায় অবধারিতভাবে আসে কিঞ্চিৎ ছন্দ ও সুরের ছোঁয়া 'এই বোধ, প্রথমে ছিল একটি ছোট্ট অংকুর।...এমনি সব সময়ে সাধনের মনে সেই বোধটা অংকুর ছেড়ে পাতা মেলল। পাতাদুটি মেলে দুই পাশে কিছু জায়গা নিল। নিচে চালিয়ে দিল তার শিকড়। সাধনের মনের পরতে পরতে সেই শিকড়টা আঁকড়ে ধরলো। এদিকে ডালপালা মেলে সমস্ত সত্তাটাকে ভরে ফেললো সেই আশর্চ্য বোধটা। গাঢ় সবুজ রোদ ঝলমলে পাতা, নিচের দিকে ছায়াঘন সবুজ, ওপরের দিকে কচি সবুজ নতুন পাতা, এর মতোই প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো সেই আশর্চ্য বোধের অংকুর।'

একটি উপমার এতটা কাব্যিক বিস্তারে ধরা পড়ে যে - বাচনিক শিথিলতা তা মহাশ্বেতা কাটিয়ে ওঠেন তাঁর দ্বিতীয় পর্বে।

আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি পরীক্ষা চালিয়েছেন 'স্বাহা' উপন্যাসে সময়কে এগিয়ে - পিছিয়ে ব্যবহার করে, যদিও তিনি স্ব ীকার করেছেন, 'রীতিটা আমার নিজস্ব উদ্ভাবন নয়'। বস্তুত মহাশ্বেতা কখনোই কথাসাহিত্যের প্রচলিত রীতি ভেঙে নতুন কিছু গড়ার আগ্রহ দেখাননি, যেমন তাঁর প্রথম পর্বে তেমনি তাঁর বৈপ্লবিক পর্বেও। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যেটুকু পরিবর্তন লক্ষ করি তা হল এক ঐতিহ্য থেকে অন্য এক ঐতিহ্যে গমন। জনপ্রিয় সাহিত্যের পাঠ্যগুণ ছাড়িয়ে তিনি আয়ত্তে আনলেন আমাদের বামপন্থী সাহিত্য ও নাটকের সেইসব রীতি - নীতি যা চল্লিশের দশক থেকে নানাভাবে পুষ্ট হয়ে সত্তরের দশকে এক নতুন মাত্রা পায়। বামপন্থী শিল্পরীতির সীমানার মধ্যেই অবশ্য তিনি তাঁর ভাষা ও আখ্যানে যে - বহুমুখীনতা এনেছেন, যে - ভাবে বহুস্তর অর্থ নির্মাণ করেন, নানান কণ্ঠস্বরে নানান দিক থেকে কেন্দ্রীয় বিষয়ের আনাচে - ক ানাচে ভাষ্য দেন তাতে আবার প্রমাণিত হয় মহাশ্বেতা দেবী এ ব্যাপারেও অনন্য।

তাঁর বর্তমান রূপান্তরের ক্ষণটি ধরা আছে 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে উচচবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন মায়ের চোখ দিয়ে দেখা সত্তরের সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত তাঁর পুত্রের রক্তাক্ত পরিণতি ও তাঁর স্বশ্রেণী ও পরিবারের হৃদয়হীনতা -- এমন একটি দৃষ্টিকোণ ভাষাকে যতটা অন্তর্মুখী করে তোলে মহাশ্বেতা তা-ই করেছেন। কাটা-কাটা বাক্যে সিনেম্যাটিক শটের মতো সুজাতার অতীত ও বর্তমান মুহূর্তের মন্তাজ গড়ে তোলেন তিনি। নকশালপন্থী ব্রতীর মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই সুজাতা তাঁর স্বামী ও কন্যাদের যে - জগৎ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গতার মোড়কে নিজের সত্তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ব্রতীর মৃত্যুর পত্রে রাজনীতিকে অনুধাবন করার তাড়নায়, ফলত পরিবারের সঙ্গে আগের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হল, এবং সুজাতার অন্তর্মুখীনতা শেষে দমিত ক্ষোভে ও ঘৃণায় এমনভাবে ফেটে পড়ে যে তাঁর অসুস্থ দেহ তা সইতে পারে না। মহাশ্বেতা কথক ও সুজাতা উভয়েরই ভূমিকায় ঘোরাফেরা করেন, যা অবশ্য নতুনকিছু নয়, কিন্তু তা এমনভাবে করেন যে পাঠকও অনায়াসে এই বাইফোকাল দৃষ্টিপথে দুজনকেই অনুসরণ করে। বস্তুত মহাশ্বেতার অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্রণে সুজাতা ব্রতী আমাদের মন অধিকার করে নেন। এমন কিছু আঙ্গিক বা ভাষার কেরামতি নেই উপন্যাসে, যা আছে তা হল সুজাতার অন্তরে পাঠককে প্রবেশ করানোর মতো আন্তরিক উচচারণ। এর প্রভাবটা এমনই যাদুকরী হয়ে ওঠে যে আমাদের খেয়ালই থাকে না, যে - উপন্যাসটি মহাশ্বেতাকে রাতারাতি পুষ - চালিত বামপন্থী সাহিত্যের প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছিল তার অনেককিছুই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। সুজাতার স্বামী দিব্যনাথ পারিবারিক মর্যাদার স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মৃতপুত্রের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেন, কিন্তু ব্রতীর জন্মের সময় বা পরেও তিনি যে পুত্রের ব্যাপারে এতটা উদাসীন কেন (বিশেষ করে সে-ই যখন সবচেয়ে ছোট) তা বোঝা যায় না। দিব্যনাথ ও তাঁর মেয়েরা এতটাই একমাত্রিক যে মনে হয় লেখক আগে থেকেই তাঁর বক্তব্য ঠিক করে রেখেছিলেন, কোনো কিছুকে ভেতর থেকে বেড়ে উঠতে দেননি। তা না হলে ব্রতীর জন্মদিনেই তুলির এনগেজমেন্টের পার্টি দেবার আয়োজনটা হবে কেন? এরকম ঘটনা যদি মহাশ্বেতা দেখেও থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ছিল, কেননা কলকাতা শহরে উচচবিত্ত পরিবারের ছেলেরা নকসাল হলে তাদের পিতারা হয় তাদের নানান কৌশলে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন, নয় তাদের যাতে জীবন বিপন্ন না হয় তার চেষ্টা করেছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে। সুজাতা ব্রতীর মৃত্যুর পর থেকেই অপরাধবোধে কষ্ট পান, যেহেতু তিনি ব্রতীর রাজনীতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি আগে; সেই অপরাধবোধ স্খালন কীভাবে হবে মহাশ্বেতা তার ইতিবাচক পরিণতি ভেবে উঠতে পারেননি। সুজাতার অ্যাপেন্ডিসাইটিস না থাকলে বড় মুশকিলে পড়তে হত তাঁকে। শেষ মুহূর্তে তা ফেটে গিয়ে সুজাতা ও লেখক দুজনকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে। এরকম মুশকিল আসানে যে গোবিন্দ নিহালনি সায় দিতে পারেননি, এবং মহাশ্বেতা দেবীও যে তাঁর অনুরোধে সুজাতার অন্যরকম এক সমাজচেতন ভূমিকা সংযোজন করেছেন, তা দেখে ইরাবান বসুরায়ের মতো অনেকেই অখুশি , আমি নই, কারণ গোবিন্দের ছবি যেমনই হোক না কেন মহাশ্বেতার উপন্যাসের দুর্বলতম অংশ সুজাতার আকস্মিক মৃত্যু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'হাজার চুরাশির মা' এক যুগ আগে বা পরে লেখা হলে এমন হইচই ফেলতে না; এ উপন্যাসের সাফল্যের পেছনে আছে দুটি উপকরণ এক, ঠিকসময় নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শহুরে পাঠকদের একইসঙ্গে বিপ্লব ও পারিবারিক ভাবালুতার যোগান দেওয়া, দুই, সুদক্ষ সিনেম্যাটিক ভাষা ও আঙ্গিকের প্রয়োগ। স্বর্ণ মিত্রই বোধহয় প্রথম যিনি 'গ্রামে চলো' উপন্যাসে শহুরে নকশালপন্থীদের গ্রামে গিয়ে কাজ করার আখ্যান উপহার দেন। কিন্তু তা ছিল নকসালপন্থী পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং ভাষায় ও আঙ্গিকে মহাশ্বেতার উপন্যাসের পাশে নিষ্প্রভ।

'হাজার চুরাশির মা'র আয়তন ও পরিমিতিবোধ ওবং সর্বোপরি অতীত - বর্তমান ও স্থানিক পরিবর্তনের দ্রুততা অনেকটাই চিত্রনাট্যের মতো। যেহেতু সুজাতার চোখ দিয়েই আমাদের দেখতে হয় সব কিছু, তাই ব্রতীর রাজনীতিটাও ক্যামেরায় ধরে রাখা টুকরো টুকরো ছবির সমন্বয় হয়ে ওঠে। এই আঙ্গিকের সুবাদেই মহাশ্বেতাকে আন্দোলনটির গভীরে যেতে হয়নি। তিনি গোর্কির 'মার'র মত আন্দোলনটিকে কাহিনীর কেন্দ্রে রাখেননি; তাঁর লক্ষ উচচবিত্ত বুর্জোয়া সমাজের ব্যবচ্ছেদ, ব্রতীর মৃত্যু উপলক্ষ্য মাত্র। তাতে অবশ্য মহাশ্বেতার কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি তো দাবি করেননি এই উপন্যাস নকশাল আন্দোলনের দলিল। কিন্তু নকশালপন্থী কিছু বুদ্ধিজীবী আবেগে প্রায় বেসামাল হয়ে সেটাই ধরে নিয়েছিলেন।

এ উপন্যাসে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ধরা পড়েছে কয়েকটি পোস্টারে যা ব্রতীর ঘরে পাওয়া যায় ---(ব্রতীর হাতে লেখা)

কেননা জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।
বন্দুকের নল থেকেই...
এই দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে
ঘৃণা কণ ! চূর্ণ কণ! চূর্ণ কন মধ্যপন্থীকে...
...আজ ইয়েনানে পরিণত হতে চলেছে।

ঠিক যেন ক্যামেরার দ্রুতগতিতে এক ঝলক দেখে নেওয়া। তাই যা পাঠ্য তাই দৃশ্য হয়ে ওঠে। স্লোগানগুলোর কয়েকটি অসম্পূর্ণ বলেই এমন গতিময় হয়ে ওঠে গোটা বর্ণনা। যেটা গুত্ব পায় তা গ্রামাঞ্চলে নকশালদের সংগ্রাম নয়, তাদের তত্ত্ব নয়, জোতদার খতম নয়, শহরে ট্র্যাফিক পুলিশ খুন নয়, লাইব্রেরি পোড়ানো নয়, মূর্তিভাঙ্গা নয়, তা হল একটি বিশেষ জাতের তণদের আত্মাহুতি।

'ব্রতীরা এক নতুন জাতের ছেলে। স্লোগান লিখলে বুলেট ছুটে আসে জেনেও ব্রতীরা স্লোগান লেখে। কাঁটাপুকুর যাবার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়।'

সুজাতার মতো মানুষের পক্ষে এর বেশি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আশা করা যায় না, কেননা ব্রতী কখনোই মাকে তার রাজনীতি বোঝানোর দায়িত্ব নেয়নি। কিন্তু এখানেও ঐ 'হুড়োহুড়ি লেগে যায়' ভাবনাটায় যে - চিত্রময়তা আছে তা আমাদের মনকে নাড়িয়ে দেয়।এইভাবে বারবার ন্যারেটর সুজাতার চিন্তাস্রোত সিনেমার সুদক্ষ সম্পাদকের মতো কেটে কেটে উপহার দেন। মাঝে - মধ্যে অবশ্য ন্যারেটর নিজের কণ্ঠেই যেন কথা বলে ওঠেন--- 'তার এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু। যারা মেদগুহীন - সুবিধাবাদী - হওয়া বদল বুঝে মত বদলানো শিল্পী - সাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবীর সমাজকে বর্জন করে।' তখন সেই বিবৃতির বহুবহৃত শব্দগুলো পাশাপাশি দৃশ্যময় বর্ণনার মধ্যে আরামদায়ক বিরতির স্বাদ আনে, ফলে দৃশ্যময়তার প্রভাব আরো বেড়ে যায়।

'কলকাতার লেখক - শিল্পী - বুদ্ধিজীবীরা ঠিক তার একবছর তিনমাস বাদে বাংলাদেশের সহায় ও সমর্থনকল্পে পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড় করে ফেলেছিল। নিশ্চয় তারাই ঠিক পথে চিন্তা করেছিল, সুজাতার মত মায়েরা ভুল পথে চিন্তা করেছিলেন।' এ কার কথা, সুজাতার না কথকের? নাকি উভয়ের? এ কথা নন্দিনীরও, 'কেন কতগুলো কবি সে সময়ে বাংলাদেশ বাংলাদেশ করে মাতামাতি করে, আর এখন কেঁদে কেঁদে কবিতা লেখে? বিট্রেয়াল!'

মহাশ্বেতার খেয়াল থাকে না, এই জনপ্রিয় উপন্যাসের মুগ্ধ পাঠকেরও থাকে না, যে এই উপন্যাসটিও লেখা হয়েছিল তার পরেই। স্বর্ণমিত্রের গ্রামে চলো বা বাঘ শিকার তার আগে লেখা হলেও প্রচার পায়নি। পরে তিনি উৎপলেন্দু চক্রবর্তী হিসেবে 'চোখ' ছবির জন্য পুরস্কৃত হন; ইতিহাসের এই পরিহাস নিয়ে মহাশ্বেতা সহজেই এমন লেখা লিখতে পারতেন যা হতে পারতো একটি ব্ল্যাক কমেডি, যেখানে আয়রনি দিয়ে মধ্যবিত্ত তণদের বৈপ্লবিক উত্থান - পতনের কাহিনীটিকে আরো ধারালো করা যেত। কিন্তু তিনি ঠিক করেছিলেন তাঁর আবেদন থাকবে আবেগের কাছে, তাই মা ও ছেলের পরিচিত সেন্টিমেন্টের সুতোটি টেনে নিয়ে যাওয়া হয় শেষ পর্যন্ত 'আমার বুকে আয়, ফিরে আয়...ব্রতী, আর পালাস না।... ঘরে ফের ব্রতী, ঘরে ফিরে আয়। তুই আর পালাস না। মার বুকে ফিরে আয় ব্রতী। এমন করে পালিয়ে যাস না।'

বোঝাই যায় মহাশ্বেতা পুত্রহারা মাতৃহৃদয়ের কান্নার যে-ঐতিহ্য (কি সাহিত্যে কি সিনেমায়) তার ওপর ভর দিয়ে পাঠকের মন অধিকার করতে প্রয়াসী। এখানেও তিনি সিনেম্যাটিক চিত্রময়তার সাহায্য নিয়েছেন, যা ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'র সেই দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয় যেখানে নীতার কান্না পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে সারা বিশ্ব ছড়িয়ে পড়ে

'সুজাতার দীর্ঘ আর্ত হৃৎপিন্ডচেরা বিলাপ বিস্ফোরণের মত, প্রশ্নের মত, ফেটে পড়ল, ছড়িয়ে গেল কলকাতার প্রতি বাড়ি -- শহরের ভিতরে নিচে ঢুকে গেল, আকাশপানে উঠে গেল। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের কোণ থেকে কোণে, দিক থেকে দিকে, ইতিহাসের সাক্ষী যত স্তূপের অন্ধকার ঘরে ও থামে, ইতিহাস ছাড়িয়ে পুরাণের বিশ্বাসের ভিতে সে কান্না শুনে বিস্মৃত অতীত, স্মরণের অতীত, গতকালের অতীত, বর্তমান, আগামীকাল সব যেন কেঁপে উঠল, টলে গেল। প্রত্যেকটা সুখী অস্তিত্বের সুখ ছিঁড়ে গেল।' এযেন কোনো চিত্রপরিচালকের শুটিং স্পিট। একটি কান্নার ধ্বনিতে ক্যামেরা ওপরে নিচে, বর্তমানে অতীতে ছুটে যায়, একটি ছবির একটির মধ্যে ডিসলভ করে। বাঙালির অতিপ্রিয় সেন্টিমেন্টের এ নবরূপায়ণেই আছে 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটির অন্তিম আবেদন।বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের ভাষা নয়, আবেগের ভাষা কতট

া চিত্রময় হয়ে উঠতে পারে তা মহাশ্বেতা নিপুণভাবে দেখিয়েছেন এখানে। সুজাতার কান্নায় আখ্যায়ক ছড়িয়ে দিয়েছেন এক প্রতীকী তাৎপর্য, যার প্রস্তুতি নেই উপন্যাসে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যার তাৎক্ষণিক অভিঘাত উপেক্ষা করা যায় না।

'হাজার চুরিাশির মা' উপন্যাসেই আমরা মহাশ্বেতার পরবর্তী রচনাশৈলীর কিছু কিছু উপাদান পাই, যেমন কাহিনীর স্তরে স্তরে সমকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য, শ্রেণীশত্রুদের ব্যঙ্গচিত্র (তুলির এনগেজমেন্টের পার্টিতে), একই কথার পুনচ্চারণ যার ফলে এক কাব্যনাটকীয় মেজাজ তৈরি হয় ('আজ সারা দিন ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন। ...ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন স ারাদিন।' অথবা 'শরীরের প্রত্যেকটি শিরা ও স্নায়ু বলছে না-না-না। স্নায়ু - শিরা- হৃৎপিণ্ড - রক্ত বলছে না - না- না।'), ...বক্তৃতাধর্মী পুনক্তি ('যারা শ্রদ্ধেয় হয় না, যাতে ব্রতী শ্রদ্ধা করতে পারে। ভালবাসে না, যাতে ব্রতী ভালবাসতে পারে। ব্রতী শ্রদ্ধা করতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়।') যা একটি বক্তব্যকে প্রায় হাতুড়ি ঠুকে মগজে ঢোকাতে চায়; এবং পরিবেশে সংক্ষিপ্ত বাক্যে সিনেমার শটের মতো এক-একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে ('সুজাতা বেরিয়ে এলেন! কলকাতার রাস্তা।')

'অগ্নিগর্ভ-তে ও অন্যত্র এসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয় আখ্যায়কের অধীত বিদ্যার ব্যঙ্গাত্মক প্রয়োগ।

'সহসা তাদের সামনে মস্ত ছায়া পড়ে ও ফ্র্যাংকেনস্টাইন সদৃশ (কি গণ্ডগোল সর্বত্র, দৈত্যস্রষ্টার নাম ফ্র্যাংকেনস্টাইন, কিন্তু জনমানসে দৈত্যের নামই ফ্র্যাংকেনস্টাইন...) বিশালাকার রামঅওতার সার্জেন্ট বহলে, 'উতারো ভ্যানসে'। (অগ্নিগর্ভ প. ১০১) ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সম্বন্ধে এই তথ্যটুকুর কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। ন্যারেটর এক্ষেত্রে একটু উঁচু জায়গা থেকে পাঠকদের সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারেননি, কারণ তিনি মনে করেছেন তাঁর জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান দুটোই প াঠকের চেয়ে অনেক বেশি। ১৫৪ পৃষ্ঠায় আবার আমরা পাই ব্রেন সম্বন্ধে কিছু মেডিক্যাল তথ্য। 'স্তনদায়িনী'র মতো বিখ্য াত গল্পেও ব্রেস্ট ক্যানসারের মেডিক্যাল বর্ণনা যদিও পরিস্থিতির বীভৎসতা ফোটাতে সাহায্য করে, কিন্তু শুধু তথ্য হিসেবে তা হাজির না করে অন্য উপায়ে পরিবেশন হলে ন্যারেটরের শিক্ষকমার্কা ভূমিকাটা কম অস্বস্তিকর হতো। যেমন 'জল' গল্পে জল সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য পরিবেশনের পরই বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাছে তার অভাবের কথা বলা হয়, এবং তাতে অভাববোধটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে 'জল -- পৃথিবীর ভূস্তরের সত্তরভাগ জল। জলের চলাচলের ফলে ভূমি নিয়ত ক্ষয় পায়, ভেসে যায়, আবার সঞ্চিত হয়। অথচ মঘাইরা জল পায় না'। 'বেহুলা' গল্পেও কালাজ সাপেরবৈজ্ঞানিক বর্ণনাও প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্য হয়ে ওঠে যেহেতু যেখানে একজন সর্প - গবেষকের গুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মহাশ্বেতা এইসব ক্ষেত্রে, এবং বিশেষ করে শবর - সাঁওতালদের ইতিবৃত্ত লিখতে যেভাবে আমাদের নানান তথ্য পরিবেশন করেছেন তা ডকুমেন্টরি থিয়েটারের একটি পরিচিত উপাদান। উৎপল দত্তের এই ধরনের নাটকেই আমরা তার প্রথম প্রয়োগ দেখি। তবে উপন্যাস ও গল্পে মহাশ্বেতাই বোধহয় প্রথম এই ভঙ্গিটি তাঁর আখ্যান - শৈলীর একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলেন।

তিনি জানেন তাঁর পাঠক কারা --- শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ, যাঁরা প্রগতিশীল হয়েও এখনও গ্রাম / শহর, নারী/ পুষ, ব্যক্তিমানুষ / দল এই বৈপরীত্যের বদ্ধমূল সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি, এবং সেই মানুষও যিনি বামপন্থী না হয়েও তথ্যনিষ্ঠ ওকালতি তারিফ করতে পারেন। দু'পক্ষের দিকে তাকিয়েই মহাশ্বেতা তাঁর আখ্যানে তথ্য ভরে দেন, কখনো ইতিহ াসের পুনরাবিষ্কারে, কখনো বা সমকালীন রাজনীতির নির্দয় উন্মোচনে। তাঁর পাঠক যে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত শহুরে ম ানুষ নয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তো নয়ই, তাতিনি নিজেই প্রমাণ করে ছাড়েন। 'অগ্নিগর্ভ'য় যে - সব সাহিত্য ও ইতিহাসের উল্লেখ বা অ্যালিউশন আছে তা আমাদেরই জন্য 'কালী ও কথা বলতে গিয়ে পুনর্বার হাঁকুড় খায় এবং বোঝে, পশ্চিমের টাকায় শটীত সোসাইটির শূন্যবাদী লেখকদের প্রচারিত "এলিয়েনেশন" থিওরিটিকে ধনতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।' এইবাবে এলিয়েনেশন, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, ওয়ানডারিং জু, কাফকাসৃষ্ট ডমিনেস্‌ড্‌ রিয়্যা লিটিজাত ইলিউসিনেটিক জগৎ, হোমিংওয়ের গল্প কাসাবিয়াংকা, আখ্যানের বুননে যখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখন ম ানতেই হয় মহাশ্বেতা ধরে নেন তাঁর পাঠক এইসবের ব্যঙ্গ ও আয়রনি সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারবে। এইপাঠক কি সমাজের অবহেলিত অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষ হতে পারে? একবার একটি পত্রিকায় এমনই একটা ইঙ্গিত দেওয়ায় বেশ কয়েকজন রিকশাওয়ালা একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তাঁরা নাকি নিয়মিত মহাশ্বেতা দেবীর লেখা পড়েন। এরকম দাবি যদি থাকে তবে বলতে হয় তাঁদের শিক্ষা - দীক্ষা অবশ্যই মহাশ্বেতার অ্যালিউশন বোঝার পক্ষে উপযুক্ত, কিংবা তাঁর ভাষায় যে - অজস্র ইংরেজি শব্দ ছড়িয়ে থাকে প্রায়শই (নির্ভুল উচচারণে) তা-ও সর্বসাধারণের পক্ষে উপভোগ্য। যেমন,

এভরিথিং কালী স্ট্যান্ডস ফর, এই ফেফজে,প্রেস গ্যাগড হয়, 'এনকাউন্টার' নামক ক্লিব শব্দটি , সত্তায় ইনজেক্টেড হয়, হেঁটে আসছে 'ইন্টেড' দৃষ্টিতে, প্রত্যেকের মুখ টেন্‌স্‌, অভ্যস্ত চিন্তার প্রেমিস, সুপিরিয়র হাসি, বিদেশ অ্যাবস্ট্রাকশন, একসপ্লোরেশন, কলোনাইজেনশন। এতো গেল বসাই টুডুর কাহিনীতে, দ্রৌপদী গল্পে আছে --- 'তখনই একজন আদিব াসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মত...', 'তিনিও প্রসপেরো', 'দেবতা প্যানের মত', 'বন্দুকের মেল অর্গান', 'নিয়ানডারথাল অন্ধকার', 'নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে'; 'জল' গল্পে পাই ইকেরাসের তুলনা, 'কামারাদোরি', 'স্তনদায়িনী'তে 'হিন্দু ফিমেল' কথাটি।

বোঝাই যায়, রিকশাওযালা বা মজুরেরা মহাশ্বেতার লেখা পড়লেও তিনি লিখেছেন আমাদের দিকে তাকিয়েই। সেটা হলেই তাঁর লেখনরীতিতে ভাষা নিয়ে মিশ্রণের খেলাটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা এতটাই যে তিনি ইচ্ছে করলেই 'ম্যাজিক রিয়্যালিজম' -এর' বা পোস্টমডার্নিস্ট কলাজের আদল তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর দ ায়বদ্ধতা শোষিত মানুষের প্রতি, বিশেষ করে যাঁরা আদিবাসী তাঁদের প্রতি -- 'ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে। অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।' এ কাজ মহাশ্বেতার আগেও অনেকে করেছেন, কিন্তু ভাষায় এলিয়টীর কায়দায় পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অ্যালিউশন প্রয়োগ কবি বিষ্ণু দে করেছিলেন, কোনো বামপন্থী কথাসাহিত্যিক করেননি। মহাশ্বেতার এই ভাষা - প্রয়োগ রীতিমতো পরীক্ষামূলক। তিনি আমদেরই একজন হিসেবে আমাদেরই ভাষায় আমাদের চেতনায় ঘা দিতে চেয়েছেন এমন আপাতপণ্ডিত্যপূর্ণ টিপ্পনীতে। একজন ন্যারেটর হিসেবে এরকম ভূমিকাগ্রহণে কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। তবে মাঝে - মধ্যে তিনিই নিজেকে স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে ফেলেছেন --- যেমন বসাই টুডুর কাহিনীতে কালী সাঁতরা সম্বন্ধে বলা হয়, 'কালীর এই বোঝার চেষ্টা খুবই আরোপিত ব্যাপার। সে বসাইয়ের কথা বসাই হয়ে বুঝতে পারবে না। কেননা সে আদিবাসী নয়। আদিবাসী হয়ে কেউ যদি জন্মায়, তবেই সে যে- বঞ্চনাবোধ নিয়ে জন্মায়, তার শরিক আপার কাস্ট বর্ণহিন্দু হতে পারে না।' তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই কালী যা পারে না ন্যারেটর তা পারেন, যদিও তিনি আদিবাসী নন। আর যদি অনাদিবাসীর পক্ষে আদিবাসীদের বোঝা সম্ভবই না হয় তবে কেন এই পণ্ডশ্রম? ঠিক এখানেই মেকি কমিউনিস্টদের গাল দিয়ে মহাশ্বেতার ন্যারেটর যতই নিজের ডিক্লাস্‌ড্‌ ভূমিকায় অবতীর্ণ হেন না কেন, একটা অসচেতন কপটতা প্রশ্রয় পেয়ে যায়।

আমরা অবশ্য জানি মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের মধ্যে যে - নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করেছেন তা এক ব্যতিক্রমী নজিরপ্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে। কিন্তু তাঁর লিখিত ভূমিকায় বিনম্র স্বীকারোক্তি থাকলেও তাঁর গল্প - উপন্যাসে একধরনের খাঁটি প্রগতিশীলতার অহংকার নিয়ে কথা বলে যান তাঁর ন্যারেটর। শোষিত মানুষের মধ্যে কাজ করেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী যে অহং বাদ দিতে পারে না, যা মহাশ্বেতা কালী সাঁতরার ব্যাপারে বলেন, তা তাঁর লেখার ভেতরেই প্রম াণ হয়ে যায়।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক, যিনি মহাশ্বেতার মতে, 'বড় মন দিয়ে আমার লেখা পড়ে, ভালবাসে, পড়ায়' (উৎসর্গ, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প), মহাশ্বেতাকে 'বুর্জোয়া লেখক' বলেননি, রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন। গায়ত্রী অগাধ পাণ্ডিত্য ও তত্ত্ব - রচনার দক্ষতা নিয়েও মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ বিচলিত নন। তিনি নারীবাদের দেরিদীয় বিস্তার ঘটিয়েও মহাশ্বেতার 'ভট্টাচার্য' থেকে 'দেবী' হবার ব্যাপারটার 'ডিকনস্ট্রাকশন' -এ কোনো আগ্রহ দেখাননি। অনুপমা দেবী, নিপমা দেবী থেকে আশাপূর্ণা দেবী, এই 'দেবী' লেজুড়টির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য শিরোধার্য করে কেমন করে একজন লেখক ভারতীয় সমাজের অবুর্জোয়া হয়ে থাকতে পারেন তা বোধহয় একটু ভাবা দরকার। নারীবাদীদের তরফ থেকে কেন এই 'দেবী' পদবিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হল না? গায়ত্রী আবার তাঁর গ্রন্থে (A Critique of Postcolonial Reason) 'দেবী'কে একটি আইনস ম্মত পদবি হিসেবেই সাহেবদের কাছে তুলে ধরেছেন--- Devi's work, Devi foregrounds, Devi's gesture ইত্যা দি। অথচ গায়ত্রীকে তো 'দেবী' হতে হয় নি! তাঁর তত্ত্বের ছকে হয়তো নিতান্তই ব্যক্তিগত ফ্যাকট আদৌ গুত্ব পায় না। তত্ত্বের ছক থাকলে সুবিধে হয়, একজন পছন্দসই লেখকের কয়েকটি বাছাই টেকসট নিয়ে একটা ভাবমূর্তি গড়া যায়, এবং রবীন্দ্রনাথকেও 'বুর্জোয়া' বলে চিহ্নিত করা যায়, সেখানে বাড়তি ডিকনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মহ াশ্বেতা তণার রচনায় প্রায়শই রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন বা শব্দ ব্যবহার করেছেন ব্যঙ্গার্থে। গায়ত্রী বড় মন দিয়ে মহাশ্বেত ার লেখা পড়তে পারেন, কিন্তু খোলা মন নিয়ে পড়ে না। তাঁর তত্ত্বের প্রভাব মহাশ্বেতার লেখাতেও যদি পড়তে থাকে তাতে

আশ্চর্য হবার কারণ নেই, কেননা 'স্তনদায়িনী' গল্পে 'হিন্দু ফিমেল' কথাটিতে মিশে আছে একটি তত্ত্বের গন্ধ। অথচ মহাশ্বেতা কখনোই মেল-ফিমেল দ্বন্দ্বটি শ্রেণীসংগ্রামের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি। গায়ত্রী 'দ্রৌপদী' গল্পে নারীত্বের যে - বিনির্মাণ ঘাটিয়েছেন তাতে 'দ্রৌপদী' যে তাঁরস্বামী ও পুষ কমরেডদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন সে সত্যটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এই অপ্রিয় সত্যটিই তুলে ধরেছেন দদর্শন পেসেক (ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, ২৯.১.৯৪)। আজকের সাবঅলটার্ন তত্ত্বের প্রচারকদের পক্ষে একজন উল্লেখযোগ্য লেখক মহাশ্বেতা, কিন্তু 'সব দলেই সৎ মানুষ আছেন' গোছের সনাতন ভাববাদী মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা কীভাবে হয় তা জানা কথা বলেন না, বলেন ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে, এবং তাও পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে। কালী সাঁতরা এতদিন কমিউনিস্ট পার্টি করেও, সৎ মানুষ হয়েও, বসাই টুডুকে বুঝতে পারে না, আমরা তো পারবো না, কিন্তু গায়ত্রী পারবেন। কেন? গায়ত্রী মহাশ্বেতার গল্প 'বড় মন দিয়ে' 'পড়ে ও পড়ায়'। কাদের পড়ায়? পাশ্চাত্যে!

সুতরাং মহাশ্বেতার আর - একরকমের পাঠক পাওয়া গেল। তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। সেটা অস্বাভাবিক নয়। কে না চায় ঝিজোড়া পাঠক! প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হল, মহাশ্বেতা কি আর - পাঁচজন প্রগতিশীল লেখক নাট্যকার ও চিত্রপরিচালকের মতোই শোষিত মানুষকে তাঁর শিল্পচর্চার বিষয় করে দেশে ও বিদেশে সেই শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও সুবিধেবাদী বুদ্ধিজীবীদের 'উপভোগ্য' করে তুলছেন না?

এ দ্বন্দ্ব আজ শুধু মহাশ্বেতার নয়, এই একতরফা ধনতান্ত্রিক ঝিায়নের যুগে সব প্রতিবাদী শিল্পীরই। এটুকু মেনে নিলে নির্দ্বিধায় বলা যায় মহাশ্বেতা বাংলার বামপন্থী শিল্পরীতিতে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন আখ্যানের ভাষা ও ভঙ্গি ও আখ্যায়কের ভূমিকায়নানা কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তুলে। তিনি একইভাবে একই বিষয় নিয়ে লেখেননি; কাহিনীর প্রয়োজনে বদলেছেন তাঁর ভাষা, মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নানান প্রচলিত রীতির যোগ চিহ্ (+) দিয়ে বাড়তি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন (নায়ক বি. কম + বি. এড + লাইব্রেরিয়ানশিপ পাশ --'ডাবল'; কৈতবখালির "ভৈরব" সংবাদপত্রের...সাংবাদিক + সম্পাদক + কম্পোজিটার + দপ্তরী + পিওনকুমারকে দেখে খেপে তা থামিয়ে দিয়েছেন ছোট্ট একটি বাক্যে, (অঝোর, দুর্বার কান্না...উত্তর কোথায়? চাঁদ সহাস্যে নিত্তর থেকে হেলে যায় আরেকটু -- 'রাম রহিমের কথা'); রিপোর্টাজের ঢঙে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রাজনৈতিক অধিনায়কের মতো ঠিক - বেঠিকের বিচারে বসেছেন (বীরসাজানে বন্দুক কি ক্ষমতা ধরে... সব সময়ে সাহেবরা জিতেছে... তারপর ন্যারেটরের মন্তব্য-- সাহেবরা জেতেনি, সব সময়, সব যুদ্ধে)।

কখনো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষ করে কোনো লড়াই -এর, ছোট ছোট শব্দে, যা সস্তা জনপ্রিয় ডিটেকটিভ গল্পে পাওয়া যায়; কখনো এমন আবেগহীন গদ্য লিখেছেন যাতে প্রচারপুস্তিকার গন্ধ পাওয়া যায় (বসাই ও পুলিশের লড়াই পৃ ১০০, অগ্নিগর্ভ; আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত হবার ইতিহাস ও তার সমালোচনা পৃ. ১২৮, ঐ)। আবার নিতান্তই রোয়াকি ভাষাও ব্যবহার করেছেন তিনি, যা সমরেশ বসুর ব্যবহার থেকে পৃথক, যেহেতু আদর্শবাদী বত্তব্য ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গির বৈপরীত্য তাঁর লক্ষ্য (যেমন হেভি কিচাইন, কেলানো)। তাঁর গদ্য হঠাৎ - হঠাৎ এই প্রাত্যহিকতার স্তর থেকেই লাফিয়ে উঠে এক অসাধারণ কাব্যিক চরিত্র অর্জন করে (চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার' -- 'দ্রৌপদী; 'সময় জাহবী, শোক বেলাভূমি। শোকের ওপর পলিমাটি চাপা পড়ে। তারপর একদিন সেই পলিমাটি ফুঁড়ে নতুন নতুন অঙ্কুরের আঙ্গুল বেরোয়' --- 'হাজার চুরাশির মা')।

তিনি রোম্যান্টিকের আবেগ ও কল্পনাপ্রবণতা, রিয়্যালিস্টের শুকনো বিশ্লেষণ এবং স্যাটিরিস্টের শাণিত বিদ্রূপ এক সঙ্গে মেশানোর চেষ্টা করেছেন। সব সময় সফল হননি, কেউই হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনি ভাবাবেগ সম্পূর্ণভাবে ছেঁটে ফেলে ভাষাকে ধারালো ছুরির মতো শুধু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজে লাগাননি। ভাষা নিয়ে তিনি খেলা করেছেন, বিশেষ বিশেষ এফেক্ট তৈরির জন্য। আলাদা আলাদা করে দেখলে তাঁর এই খেলার উপকরণগুলি অনেকটাই আমাদের পূর্বপরিচিত, কিন্তু মিলে মিশে তারা যে - শিল্পরীতি তৈরি করে তা তাঁর আর - এক অন্যতার সন্ধান দেয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com